বিদ্যুৎ উৎপাদনে সংকট বনাম সম্ভাবনার খণ্ডচিত্র

মওদুদ রহমান

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সুলভ জ্বালানির খোঁজে বাংলাদেশ সংকটকাল পার করছে। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের কৃষি, অর্থনীতি, শিল্পের প্রসার আর প্রবৃদ্ধি। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা এখন আর একমুখী হলে চলে না; হতে হয় বহুমাত্রিক। উৎপাদনে শুধুমাত্র জ্বালানি মূল্য হিসাব করলেই চলে না, বরং খুঁজতে হয় পরিবেশের ওপর এর প্রভাব। আপাত অভাব মেটাতে শুধু বিদেশি পুঁজি কিংবা জ্বালানির পেছনে ছুট লাগালেই হয় না; বরং নিজস্ব সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা জারি রাখতে হয়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে সংকটের মধ্যেও সঠিক পথ বেছে নিলে উন্নয়নের টেকসই যাত্রা গতিশীল করা সম্ভব।

গত শতাব্দীর শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ক্ষতির কথা চিন্তা না করেই জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধির সূচনা করে। প্রবৃদ্ধি অর্জনের এই টোটকা ওষুধে পরবর্তীতে আকৃষ্ট হয় জাপান আর চীন। এতে তাৎক্ষণিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ঠিকই, কিন্তু এর ফলে বিভিন্ন খাতে হয়ে যাওয়া ক্ষত এখন দগদগে ঘায়ে পরিণত হয়েছে। অবস্থার ভয়াবহতা এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে চীনে এখন বোতলজাত বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহের ব্যবসা পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে। চীন সরকার ইতোমধ্যেই এর ভূসীমায় থাকা ৪০ শতাংশ স্তন্যপায়ী প্রজাতির অস্তিত্ব সংকটাপন্ন বলে ঘোষণা দিয়েছে[১]। কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দূষণ থেকে বাঁচতে চীন সরকার ২০১৩ সাল থেকে পরবর্তী ৫ বছরে ২৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধুমাত্র দূষিত বাতাস থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য[২]। বিশ্ব পরাশক্তির অন্যতম অংশ চীনের জন্য এই বিনিয়োগ প্রতিরক্ষা বাজেটেরও দ্বিগুণ।

দূষণে এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে এই বিষের সর্বগ্রাসী রূপ উন্মোচিত হয় গত শতাব্দীর আশির দশকে এসে। সে সময় বিজ্ঞানীরা তথ্য-প্রমাণ-যুক্তি-গবেষণা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে এভাবে চলতে পারে না। কিন্তু এরই মধ্যে হাজার কোটি ডলারের কয়লা বাণিজ্য দানবের আকার পেয়ে গেছে। নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে তখন থেকেই শুরু হয় গবেষণার পরিবর্তে প্রোপাগান্ডার প্রচার আর যুক্তির বিপরীতে কুৎসা রটনার কাল, যা এখন পর্যন্ত চলছে। কয়লাকে 'পরিবেশবান্ধব' হিসেবে প্রচার করতে নিয়োগ দেওয়া হয় লবিস্ট, তৈরি হয় বাহারি বিজ্ঞাপন, বাজারে আসে 'ক্লিন কোল টেকনোলজি'র নামে নতুন বোতলে পুরনো মদ। এই মাফিয়াদের জাল থেকে বেরিয়ে আসা কখনোই খুব সহজ কিছু ছিল না। এর পরও গণমানুষের দাবি আর নানামুখী আন্দোলনে অনেক দেশই ঘুরে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়াচ্ছে।

কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দূষণ থেকে বাঁচতে চীন সরকার ২০১৩ সাল থেকে পরবর্তী ৫ বছরে ২৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধুমাত্র দূষিত বাতাস থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। বিশ্ব পরাশক্তির অন্যতম অংশ চীনের জন্য এই বিনিয়োগ প্রতিরক্ষা বাজেটেরও দ্বিগুণ।

চীন মোটামুটিভাবে ২০০৪-০৫ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়নে মনোনিবেশ করে। ২০০৪ সাল থেকে শুরু করে মাত্র ১০ বছরের চেষ্টায় চীন এই বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে শীর্ষস্থানে চলে আসে। বর্তমানে এই জ্বালানিভিত্তিক প্রযুক্তি বাজারের প্রায় পুরোটাই চীনের দখলে। শুরুর দিকে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের কোনো বালাই না থাকলেও এখন তাতেও বেশ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ডেনমার্কে বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৪০ শতাংশই আসছে বায়ুবিদ্যুৎ থেকে, ২০২০ সালের মধ্যেই তা ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে[৩]। অথচ সত্তরের দশকের আগ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই ছিল আমদানি করা তেলনির্ভর। ১৯৭৩-এ তেল বাণিজ্যে অবরোধ জারি হলে সেই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে তারা বেছে নেয় নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে। ১৯৭৯ সালে ডেনমার্কে প্রথমবারের মতো ৩০ কিলোওয়াট সক্ষমতার বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবেই চালু হয়। সে সময় সংকটকালীন অবস্থা জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলার জন্য তাপভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর কর্মদক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনকালে উৎপন্ন তাপশক্তির যে অংশটুকু অপচয় হয়ে যায়, সেটার প্রায় পুরোটাই কাজে লাগানোর চিন্তা শুরু হয়। বর্তমানে ডেনমার্কে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মদক্ষতায় চলছে, যেখানে বিশ্বে এর গড় পরিমাণ মাত্র ৪০ শতাংশ[৪]। আর সে সময় নেওয়া ভবিষ্যৎ মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি অন্বেষণে যে জোর দেওয়া হয়েছিল তার সুফল ইতোমধ্যেই ডেনমার্ক পেতে শুরু করেছে। বায়ুবিদ্যুৎকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিল্পে ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ ২৯ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়, যা পশ্চিম ডেনমার্কের মোট কর্মসংস্থানের ৭৮ শতাংশ[৩]। ডেনমার্ক ইতোমধ্যেই ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করছে[৩]।

জার্মানি সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে এতটাই এগিয়েছে যে এ বছরের ১৫ মে তারিখে সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের প্রায় পুরোটাই নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়[৫]। অথচ দুই যুগ আগেও সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল কয়লা আর পরমাণু প্রযুক্তিনির্ভর। চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর সেখানে পরমাণুবিদ্যুতের প্রতি সম্মোহনের ঘোর কাটে আর ফুকুশিমা দুর্ঘটনার পর সেই ধারণা জার্মানিতে পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়।

নব্বইয়ে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একত্রীকরণের পর পূর্ব জার্মানির অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে সেখানে সোলার ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা হয়। গত কয়েক বছরের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সোলার সেল উৎপাদনে চীনের আধিপত্য বিস্তারের আগের প্রায় ২০ বছর এই প্রযুক্তি উন্নয়ন গবেষণা আর বাজারের পুরোটাই ছিল জার্মানির দখলে। জার্মানি ইতোমধ্যেই ২০২২ সালের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আর এর বিপরীতে ২০৩০ সালের মধ্যেই ৪৫ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করছে[৬]।

কয়লার ব্যবহার কমছে না বাড়ছে?

বাংলাদেশে রামপাল প্রকল্পবিরোধী আন্দোলন এখন তুঙ্গে। সুন্দরবন

বাঁচাতে কয়লাভিত্তিক প্রকল্পবিরোধী এই আন্দোলনে ইতোমধ্যেই যোগ দিয়েছে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সচেতন মানুষ। অন্যদিকে কয়লা মাফিয়াদের প্রোপাগান্ডাও চলছে বেশ জোরেশোরেই। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নজিরবিহীনভাবে এই প্রকল্পের গুণগান প্রচার করতে চুক্তি করেছে বিজ্ঞাপনী সংস্থার সাথে। বিদেশ থেকে উড়িয়ে আনা হচ্ছে ভাড়াটে বিশেষজ্ঞ, দেশের ভেতরেও টাকার লোভে মাথা বেঁচে দিয়েছেন কয়েকজন।

এসব কীর্তিকলাপ বাংলাদেশে নতুন হলেও কয়লা শিল্পের অন্ধকার অতীতে দেশে দেশে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে। এসব প্রচারণায় বাতিল কয়লাকে প্রায় সোনার পর্যায়ে উঠিয়ে আনা হয়েছে। বিজ্ঞাপনগুলো দেখে মনে হচ্ছে, কয়লাই পৃথিবীতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি! প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এসব প্রচারণা দেখেশুনে কয়লা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানির মতো দেশগুলোর জন্য আফসোস হবে। মনে হবে, আহা! বোকা দেশগুলো বুঝি বা কিছু না জেনেবুঝেই কয়লার ব্যবহার থেকে সরে আসছে।

রামপাল প্রকল্পের বিরুদ্ধে কথা উঠলেই পাল্টা বক্তব্য আসে, অমুক দেশ অত পরিমাণ কয়লাবিদ্যুৎ করতে পারলে আমরা পারব না কেন? কথাটা আংশিক সত্য। পৃথিবীতে উন্নত অনেক দেশের কয়লা ব্যবহারের হার এখনো ৫০ শতাংশেরও বেশি। কিন্তু তারা যখন কয়লার ব্যবহার শুরু করে, তখন এর প্রভাব নিরূপণে না ছিল কোনো ধারণা, না ছিল কোনো গবেষণা। আবার সে সময় প্রয়োজন মেটাতে এখনকার মতো অন্য কোনো বিকল্প যে ছিল তা-ও নয়। দেড় শ বছরের কয়লা ব্যবহারের সময়কালে এর প্রভাব নিয়ে জোরেশোরে আলাপ শুরু হয়েছে কেবল দুই যুগ আগে। অর্ধেক সত্য মেশানো ভ্রান্ত প্রচারণায় যেসব দেশের কয়লা ব্যবহারের পরিসংখ্যান দেখানো হয় সেই সব দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানিভিত্তিক বছরপ্রতি প্রবৃদ্ধি হিসাব করলেই কয়লার তীব্র দূষণ থেকে শিক্ষা নিয়ে অভিশপ্ত যুগ থেকে বের হয়ে আসার প্রতিযোগিতার চিত্র উঠে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, যুক্তরাজ্য, ভারত ও জার্মানির মধ্যে ২০০০ থেকে ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, চীনের কয়লা ব্যবহার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। বিপরীতে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে কয়লার পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপের তীব্রতা বোঝা যায় সৌর, বায়ু, জিওথার্মাল এবং জোয়ার-ভাটার উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির বছরপ্রতি সূচকে। চীনে এই হার ৩০.৫ শতাংশ, যেখানে কয়লা ব্যবহার বৃদ্ধির হার ৯.২৫ শতাংশ*। ভারতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবহার বৃদ্ধির হার ২৬ শতাংশ*। জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই হার যথাক্রমে ১৪, ১৪ ও ২ শতাংশ*। বিপরীতে জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক*। অর্থাৎ এ দুটি দেশ বিকল্প জ্বালানির সংস্থান করে ইতোমধ্যেই কয়লার ব্যবহার কমিয়ে ফেলেছে। যদিও ২০০০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে পৃথিবীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দেড় গুণ। অথচ সংখ্যা উপস্থাপনার খেলায় আমাদের বোঝানো হচ্ছে, উন্নয়নের জন্য নাকি কয়লা ব্যবহারের বিকল্প নেই! ২০৩০ সালের মধ্যে জমি দখল করে, বন উজাড় করে, পানি নষ্ট করে ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদন করা ছাড়া যেন আর কোনো উপায় নেই। অথচ বাইরের দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উন্নতি অর্জনের সম্ভাবনা অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি। আমাদের কেন আগুনে ঝাঁপ দিয়েই এর আঁচটা বুঝতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর নীতিনির্ধারকরা দেবেন কি?

বিজ্ঞাপনগুলো দেখে মনে হচ্ছে, কয়লাই পৃথিবীতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি! প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এসব প্রচারণা দেখেশুনে কয়লা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানির মতো দেশগুলোর জন্য আফসোস হবে। মনে হবে, আহা! বোকা দেশগুলো বুঝি বা কিছু না জেনেবুঝেই কয়লার ব্যবহার থেকে সরে আসছে।

বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি

পানচাষি ছাত্তার মিয়া গঞ্জের যে দোকান থেকে চাল-ডাল কেনেন, সেই দোকানের মালিকের বাড়ি ওখানেই আর যে দোকান থেকে সোলার প্যানেল কিনেছেন, সেই দোকানের সেলসম্যান আসেন অন্য কোনো শহর থেকে, হেড অফিস ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশান, বারিধারা কিংবা মহাখালীতে। ব্যবসায় লাভ-লোকসান থাকে, কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লাখ সোলার হোম সিস্টেম কোনো ব্যবসায়িক মডেলে পৌঁছানো হয়নি। সেটা হয়েছে সাহায্য সংস্থার টাকানির্ভর প্রজেক্ট মডেলে। এই মডেলে পণ্যের মান গৌণ, সংখ্যাটাই মুখ্য। ক্রেতার সুবিধা পরে, ডোনার এজেন্সির টার্গেট পূরণ করাটাই আগে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে সৌর, বায়ু কিংবা বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার্গেট বাংলাদেশও ঘোষণা করেছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নে কুড়িয়ে এনেছে এরই মধ্যে বাতিল বলে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া মডেলটাই। এই মডেলে বাজার ব্যবস্থার নিয়মে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা তৈরি হয় না, বরং মাফিয়া ঢঙে তৈরি হয় ব্যবসায়ীদের গ্যাং। এ কারণেই ছাত্তার মিয়া তাঁর ঘরের চালে বসানো সোলার প্যানেল, ব্যাটারি, চার্জার কেনার সময় মান অনুসারে দাম যাচাইয়ের কোনো সুযোগ পান না, কেননা সেখানে অন্য কোনো দোকান নেই। আবার প্রজেক্টের টাকা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওই দোকানটাও এলাকা থেকে নাই হয়ে যায়। তখন কারিগরি সমস্যা কিংবা পরামর্শের জন্য ওই দোকানের ওপর নির্ভরশীল শত শত গ্রাহক কার কাছে যাবে, কী করবে– কিছুই বুঝতে না পেরে সৌর বাতি থেকে আবার কুপি ব্যবহারের কালে ফিরে যায়। অথচ এটা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই, করণীয় ঠিক করতে কোনো উদ্যোগ নেই। আমরা শুধু ৪০ লাখ পরিবারের কাছে সোলার হোম সিস্টেম পৌঁছে দেওয়ার তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছি, অথচ কত লাখ গ্রাহকের বাড়িতে তা কেবলই শোভাবর্ধনের বস্তুতে পরিণত হয়েছে, সেটা জানতে চাইছি না। অথচ কোনো বড় লক্ষ্য অর্জনে প্রজেক্টকেন্দ্রিক অনিয়মিত এ ধরনের কার্যকলাপের ব্যর্থতার উদাহরণ আমাদের চারপাশেই রয়েছে। এমনকি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়নের অংশ হিসেবে বায়োগ্যাস সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেখানেও রয়েছে এই ব্যর্থতার গল্প। এক জরিপে দেখা গেছে, বসানো বায়োগ্যাস প্লান্টগুলোর ২১ শতাংশই কাজ করছে না, ৭৬ শতাংশ কারিগরি ত্রুটির কারণে কম উৎপাদন করছে, কেবল ৩ শতাংশ বায়োগ্যাস প্লান্ট পূর্ণ ক্ষমতায় চলছে[৭]।

আমাদের 'ভুল করাতেই' যেন আনন্দ! অথচ দেশে দেশে কোনো কারণে হয়ে যাওয়া ভুল নতুন কিছু শিখে নেওয়ারই উপলক্ষ। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৭৮ সালে সেখানে বায়ুকল স্থাপন উৎসাহিত করতে কর মওকুফ সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে সাড়া দিয়ে সেখানে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর এসে দেখা যায়, যে পরিমাণে স্থাপনা তৈরি হচ্ছে, সে অনুযায়ী উৎপাদন হচ্ছে না। কেননা সরকারের ঘোষিত সুবিধা গ্রহণে কেবল সংখ্যার প্রাধান্য ছিল, ন্যূনতম মান বজায় রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। আর এই সুযোগে এরই মধ্যে

বসিয়ে ফেলা হয় নি কর্মদক্ষতার সস্তা উৎপাদন যন্ত্র। বিফলে যায় শত কোটি ডলারের আয়োজন। অবস্থা পর্যালোচনা করে ১৯৯২ সালে দ্রুততার সঙ্গে নীতি পরিবর্তন করা হয়। তখন থেকেই ঘোষিত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে দেওয়ার রীতি চালু হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত বিশ্বের দেশগুলো জ্বালানি ব্যবহারে বহুমাত্রিকতা আনয়নের কার্যক্রম অনেক আগে থেকেই শুরু করায় শুরুর দিকে অনেক কিছুই তাদের প্রথমবারের মতো করতে হয়েছিল। ফলে ওই ভুলভ্রান্তি অনেকটাই ছিল প্রত্যাশিত। তারা এ কাজ করতে গিয়ে প্রায় তিন যুগ ধরে ঠেকে ঠেকে নানা কিছু শিখে নিজেদের পরিবর্তিত করতে পেরেছে বলেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে এখন একের পর এক মাইলফলক অর্জন করছে। বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেক পরে এ খাত উন্নয়নের যুগে প্রবেশ করায় স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ওই সব ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু আমরা অন্যদের ভুলের উদাহরণ দেখে শিক্ষা তো নিইনি, বরং নিজেদের ভুলগুলোও বারবারই করে যাচ্ছি।

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা প্রয়োজন

কয়লাবিদ্যুতের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরলে যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জার্মানি কিংবা ভারতের দিকে আঙুল তুলে ধরেন, তাঁরা কিন্তু সত্যটা ঠিকই জানেন কিন্তু তর্কে জিততে পুরোটা প্রকাশ করেন না। তাঁরা কিন্তু এটাও বোঝেন যে কয়লা কেবল তখনই সস্তা হিসেবে বিবেচিত হয়, যখন এর প্রভাবে হতে থাকা ক্ষতির ওপর কোনো দাম ধরা হয় না। কিন্তু যুক্তির আসরে হেরে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা সে প্রসঙ্গে কথাই বলেন না। কয়লাবিদ্যুতের পক্ষে ওকালতি করতে আসা সেই বিজ্ঞজনেরা এটাও জানেন যে কয়লার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে দেশে দেশে চলছে সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। কিন্তু বাংলাদেশে বিকল্প জ্বালানি অন্বেষণ আয়োজনের শূন্যতা তাঁরা বেমালুম চেপে যান।

কয়লার বিপরীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারকে যাঁরা ফ্যান্টাসি বলে প্রচার করেন, তাঁরা কি জানেন যে যুক্তরাজ্য ২০২৫ সালের মধ্যেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে[৮]? তাঁরা কি জানেন যে স্কটল্যান্ড এ বছরই নিজেদের শেষ কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিও অবসরে পাঠিয়ে দিয়েছে[৯]? তাঁরা কি জানেন যে কয়লা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার এই কালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খনন কোম্পানি পিয়াবডি এনার্জি এ বছরই নিজেদের স্বেচ্ছায় দেউলিয়া ঘোষণা করেছে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তাঁরা নিশ্চিতভাবেই জানেন, কিন্তু মুখ খোলেন না। তাঁরা বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের খুঁত ধরতেই ব্যস্ত, কিন্তু এর আনুষঙ্গিক সুবিধাগুলো নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা প্রায় দেড় শ বছর ধরে হাজার কোটি ডলার খরচে গড়ে ওঠা জীবাশ্ম জ্বালানিকেন্দ্রিক কাঠামোয় আপাত কম মূল্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে কেবলই দৃশ্যপটে আসা নবায়নযোগ্য জ্বালানির সস্তা তুলনা করেন। তাঁরা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে দেড় শ বছরের জঞ্জাল নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে রাতারাতি পরিষ্কার করে ফেলার সাম্ভাব্যতা যাচাই করেন। তাঁরা আজকে গাছ লাগিয়ে কালকেই ফলটা পেতে চান। তাঁরা কয়লার দূষণ নিয়ে কথা বললে সংখ্যা নিয়ে খেলা করেন আর আমাদের বোঝাতে চান চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও জার্মানির কয়লা রাজত্ব। কিন্তু তাঁরা কি জানেন, ২০০৪ সাল থেকে শুরু করে ১০ বছর সময়কালে দেশে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে প্রতিযোগিতা চলছে, সেখানে চীন প্রথম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয়, জার্মানি চতুর্থ আর ভারত পঞ্চম স্থানে রয়েছে?

২০২১ সালের মধ্যেই মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর বাংলাদেশ কয়লাকে কেন্দ্র করে জ্বালানি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর ছক কাটছে। অথচ এই পরিকল্পনায় প্রযুক্তি স্থানীয়করণের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার প্রণোদনা নেই, সক্ষমতা অর্জনের আয়োজন নেই, রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেই। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রায় পুরোটাই কয়লাকেন্দ্রিক আর বাকিটা আমদানিনির্ভর। অথচ আমাদের সমুদ্র সীমানায় রয়েছে গ্যাস প্রাপ্তির এক বিশাল সম্ভাবনা। হাজার হাজার টন বর্জ্য সম্পদ ব্যবহার করা যাচ্ছে না সামান্য উদ্যোগের অভাবে। সৌরবিদ্যুৎ সম্প্রসারণের আয়োজন ঢুকে গেছে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পকেটে।

২০৪১ সালের মধ্যেই উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখা বাংলাদেশের মাথাপিছু নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা মাত্র ১ ওয়াট, যেখানে নি আয়ের দেশের তালিকায় থাকা কেনিয়াতে পর্যন্ত এর পরিমাণ ৫ ওয়াট। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জার্মানির সাথে আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানির আধুনিক ব্যবহারের তুলনা করার চিন্তাই করা যায় না, এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথেও না।

বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আমাদের নেওয়া টোটকা পদ্ধতিতে সংকট আগামী দিনগুলোতে আরো বাড়বে বৈ কমবে না। হাতে এখনো বুঝি বা কিছু সময় আছে সবকিছু ঠিকঠাকভাবে শুরু করার, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

* আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (IEA) জ্বালানি সংক্রান্ত উপাত্ত (Sankey Diagram) বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত
http://www.iea.org/sankey/#?c= Bangladesh&s=Balance

মওদুদুর রহমান: প্রকৌশলী
ইমেইল: mowdudur@gmail.com

তথ্যসূত্র

[1] The East is grey. The Economist. [Online]. Available: http://www.economist.com/news/briefing/21583245-china-worlds-worst-polluter-largest-investor-green-energy-its-rise-will-have.

[2] China pledges $275 billion over 5 years to cut record air pollution. [Online]. Available: https://news.mongabay.com/2013/08/china-pledges-275-billion-over-5-years-to-cut-record-air-pollution/.

[3] Wind EnergyÑThe official website of Denmark. [Online]. Available: http://denmark.dk/en/green-living/wind-energy/.

[4] Jeffrey Ball: Rational Approaches to Renewable EnergyÑYouTube. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=3eG9lqbNDt0.

[5] Germany Just Got Almost All of Its Power From Renewable EnergyÑBloomberg. [Online]. Available: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-16/germany-just-got-almost-all-of-its-power-from-renewable-energy.

[6] Germany Leads Way on Renewables, Sets 45% Target by 2030. Worldwatch Institute. [Online]. Available: http://www.worldwatch.org/node/5430.

[7] E. U. Khan and A. R. Martin, Review of biogas digester technology in rural Bangladesh, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 62, pp. 247–259, 2016.

[8] UK aims to close coal-fired power plants by 2025 | Reuters. [Online]. Available: http://uk.reuters.com/article/uk-britain-energy-policy-idUKKCN0T703X20151118.

[9] After 115 Years, Scotland Is Coal-Free. [Online]. Available: https://thinkprogress.org/after-115-years-scotland-is-coal-free-f1f6a5f4d190#.feu59myin.